শহীদ কাসেম সোলাইমানি : অন্তহীন এক বীরের মহান কীর্তি

সিরাজুল ইসলাম

সমসাময়িক বিশ্বে ইরানের ইসলামি বিপ্লব এবং বিপ্লব-পরবর্তীকালে কুদস ফোর্স গঠন– এ দুটি বিষয়ের যে ভূমিকা, যে প্রভাব তা নিয়ে বহু আলোচনা ও ব্যাপক গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। ইরানের ইসলামি বিপ্লব ও কুদস ফোর্স একেবার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ নিয়ে মানুষকে জানানোর এখনও অনেক কিছু বাকি রয়েছে।

১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার পর ইহুদিবাদী ইসরাইলকে ইরান মুসলমানদের জন্য প্রধান শত্রু ঘোষণা করে। এই শত্রুর দখলে যেমন চলে গেছে নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের ঘর-বাড়ি ও ভূখণ্ড, তেমনি এই অপশক্তি মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা মসজিদুল আকসা দখল করে রেখেছে। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, এই বর্বর শক্তি মসজিদুল আকসা দখল করে রাখলেও, লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে উদ্বাস্তু করলেও তার পক্ষে অবস্থান নেওয়া আরব দেশের সংখ্যা একেবারে কম নয়। খোদ ইরানের শাসক রেজা শাহের সঙ্গেও ইসরাইলের ছিল বিরাট দহরম-মহরম। ফলে বিপ্লব-পরবর্তী ইরানের ইসলমি নেতৃত্বকে বেছে নিতে হয় বিরাট এক কঠিন পথ, পবিত্র আল-কুদস উদ্ধারের সংগ্রামময় পথ।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে যারা মেনে নিতে পারেনি তারা নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু করে বিপ্লব নস্যাৎ করার জন্য। এর অংশ হিসেবে ১৯৮০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ইরানের ওপর ইরাকের সাদ্দাম সরকার সামরিক আগ্রাসন শুরু করে। সেই যুদ্ধের সময় ইরান কুদস ফোর্সকে একটি বিশেষ গোয়েন্দা ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৮ সালে আট বছরের যুদ্ধ শেষে কুদস ফোর্সকে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি'র স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়। এই বাহিনীর মূল কাজ হয়ে ওঠে শত্রুর কবল থেকে 'মুসলিম ভূখণ্ড' বিশেষ করে ইসরাইলের কবল থেকে পবিত্র জেরুজালেম আল-কুদস শহর উদ্ধার। এজন্য মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলামি শক্তিকে বিশেষ করে লেবানন ও ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত হিজবুল্লাহ, হামাস ও ইসলামি জিহাদ আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা শুরু করে ইরান। কুদস ফোর্স গঠনের সময় এর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় আইআরজিসি'র সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমাদ ওয়াহিদিকে। কুদস ফোর্সের প্রধান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৮ সালে এই বাহিনীর দায়িত্ব পান মেজর জেনারেল কাসেম সোলাইমানি। সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। দায়িত্ব পালনকালে অনেক বড় ও কঠিন সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে তাঁকে। বলা যায়, তাঁর ভূমিকার কারণে আজকের মধ্যপ্রাচ্যের এই চেহারা আমরা দেখছি, তিনি ব্যর্থ হলে হয়ত ভিন্ন চেহারা দেখতে হতো। বিশেষ করে ইরাক ও সিরিয়ায় বিদেশী মদদে তৎপর উগ্র তাকফিরি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে জেনারেল কাসেম সোলাইমানি যে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তবে তাঁকে শেষ পর্যন্ত জীবন দিতে হয়েছে, জীবন দিয়েই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করতেন তা হয়ত পূরণ হয়েছে কিন্তু তাঁকে হত্যার জন্য ভয়াবহ কলঙ্কের অধিকারী হয়েছে মার্কিন সরকার।

এই বিপ্লবী ও কুশলী সমরনায়কের শাহাদাতের পর তাঁকে নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা, যে আকুলতা দেখা গেছে তা ইতিহাসে বিরল। তবুও অনেকে প্রশ্ন তোলেন কেন ইরাক ও সিরিয়ার ঘটনাবলিতে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী জড়িয়ে পড়ল?

আমরা সবাই জানি যে, সিরিয়া ঐতিহাসিকভাবে ইরানের মিত্র দেশ। ১৯৭৯ সালে যখন ইরানে ইসলামি বিপ্লব সফল হয় তখন মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র দেশ সিরিয়া ইরানের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে সমর্থন করেছে তৎকালীন হাফেজ আল-আসাদের সরকার। যদিও সিরিয়া ইসলামি শাসনের অধীনের কোনো দেশ ছিল না, কিন্তু ইরানে ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার পরে যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের নানান সমীকরণ নিয়ে যখন

বহুমুখী হিসাব-নিকাশ চলছে তখন একেবারে নিঃশর্তে ইরানের প্রতি সমর্থন জানায় দেশটি। একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা ও বোঝার জন্য এই কথাটি স্মরণে রাখা দরকার। ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের আইআরজিসির জড়িয়ে পড়ার এটি একটি প্রেক্ষিত।

ইরানের সঙ্গে সিরিয়ার আলাদা রকমের ঘনিষ্ঠতা অনেক আগে থেকেই ছিল। যখন ইরানে ইসলামি বিপ্লব সফল হলো এবং ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো তার পরপরই এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য, বিপ্লবকে নস্যাৎ করার জন্য আঞ্চলিক বহুসংখ্যক রাজতান্ত্রিক দেশ, ইহুদিবাদী ইসরাইল, আমেরিকা, ব্রিটেন ও তাদের পশ্চিমা মিত্ররা অনেক বেশি তৎপর হয়ে উঠল। কিন্তু নানা চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও যখন ইরানের ইসলামি সরকারকে উৎখাত করা গেল না তখন ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দামের সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে সদ্য বিপ্লব সফল হওয়া দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো, যা আট বছর ধরে চলে। এতে দুই দেশের লাখ লাখ মুসলিম নরনারী নিহত হলেন। এই বিশাল হত্যাকাণ্ড, এই যে এত বড় সম্পদের হানি, ধ্বংসযজ্ঞ তার প্রধান দায় আমেরিকা, ইসরাইল ও তার দোসরদের। এক্ষেত্রে তারা স্বৈরাচারী ও উচ্চাভিলাসী সাদ্দামকে ব্যবহার করে।

ভয়াবহ সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে যখন ইরানের ইসলামি বিপ্লব ও বিপ্লবী সরকারকে অকার্যকর করে দেওয়ার প্রচেষ্টা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে তখন সিরিয়ার সরকার ইরানের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ইরানের সঙ্গে সিরিয়ার সরাসরি সীমান্ত না থাকার পরেও সিরিয়া তার সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছে। এমনকি, ইরাকের অভ্যন্তরে বিমান হামলা চালানোর জন্য সিরিয়া তার আকাশসীমা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা বুঝতে পারলে সিরিয়ার গত এক দশকের সংঘাতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জড়িয়ে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ বোঝা যায়। অর্থাৎ ইরানের বিপদের দিনে সিরিয়া যেভাবে সাহায্য করেছে, সিরিয়ার বিপদের দিনেও ইরান সেভাবে সাহায্য করেছে। ইরান অবশ্যই নিজে থেকে গায়ের জোরে সিরিয়ায় যায় নি, বরং বাশার আল-আসাদ সরকারের আমন্ত্রণে গিয়েছে; যেমনটি এসেছে রাশিয়া।

ইরানের ভেতরে ইরাকের সাদ্দাম সরকারকে দিয়ে আগ্রাসন চালিয়ে শত্রুরা যেসব লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছিল তা হলো না। অর্থাৎ ইরানের ইসলামি বিপ্লব ও ইসলামি সরকারকে নস্যাৎ করা বা ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি। বরং এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে ইরানের অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলোকে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা হলো। যুদ্ধে ইরান সবচেয়ে বড় যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করলো সেটি হচ্ছে যে, তার পাশে তেমন কেউ নেই, যা করার তা নিজেকেই করতে হবে। ফলে ইরান নিজেকে সবদিক দিয়ে উন্নত ও শক্তিশালী করার চেষ্টায় নিয়োজিত হলো। পাশাপাশি যে সাদ্দামকে দিয়ে ইরানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে, একসময় সেই সাদ্দামকে আমেরিকা ও তার মিত্ররা উৎখাত করে দিল, হত্যা করল। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস!

যাইহোক, সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাক আর সাদ্দাম-পূর্ববর্তী ইরাক এক কথা নয়। আকাশ-পাতাল ব্যবধান বলা যায়। সাদ্দামকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে ইরাকে লুকিয়ে থাকা ইসলামি বিপ্লবের প্রভাব অনেকটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইরাকে সাদ্দাম নিহত হওয়ার পর প্রেক্ষাপট বদলে যায়। বিপ্লবের প্রভাবের ফলে নতুন একটি ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠে যা আমেরিকা, ব্রিটেন, ইসরাইল ও তাদের অনেক আরব মিত্রের জন্য ভীতির কারণ হয়ে দেখা দেয়। সাদ্দামকে উৎখাত করা আমেরিকার জন্য এক রকমের জরুরি হয়ে পড়েছিল আবার তাকে উৎখাত করার ফলে নতুন ও কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়ে তারা। নতুন ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় মধ্যপ্রাচ্যে ইরান হয়ে ওঠে অনেক বেশি প্রভাবশালী দেশ, ইরানই হয়ে পড়ে এই বলয়ের নেতা।

ইরানে ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার পর যেসব কারণে আমেরিকা ও তার দোসরদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার অন্যতম প্রধান হচ্ছে, তেল ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়। তারা মনে করেছিল ইরান যেভাবে পাশ্চাত্যকে 'না' বলে দিয়েছে, ইরানের বিপ্লব টিকে গেলে তার প্রভাব আরো দেশের ওপর পড়বে। মধ্যপ্রাচ্যের আরো দেশের ওপর ইরানি বিপ্লব প্রভাব ফেললে সেসব দেশও তেল ও খনিজ সম্পদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। এতে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে এক সময় আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রদের কর্তৃত্ব খর্ব হবে। এসব ভেবে নতুন নীলনকশা প্রণয়ন করে আমেরিকা ও ইসরাইল যার নাম দেওয়া হয় 'নিউ মিডলইস্ট প্ল্যান' বা 'নতুন মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা'। এ

পরিকল্পনার আওতায় ভূমধ্যসাগর থেকে চীনের পাদদেশ পর্যন্ত নতুন মধ্যপ্রাচ্য গঠনের নীলনকশা হাতে নেয় আমেরিকা ও ইসরাইল। নতুন মধ্যপ্রাচ্য গঠিত হলে তার কর্তৃত্ব থাকবে আমেরিকা ও ইসরাইলের হাতে। এ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় প্রধানত প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়কালে এবং জর্জ ডাব্লিউ বুশের আমলে তা প্রকাশ্যে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এ নিয়ে কাজ করেছেন বুশ ও তার সহযোগী ডিক চেনি, রোনাল্ড রামসফিল্ড, কন্ডোলিৎজা রাইস, ম্যাককেইন প্রমুখ নব্য-রক্ষণশীলরা।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তারা বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। এসব কর্মসূচি হলো- রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে সিরিয়া ও ইরানকে ধ্বংস করে ফেলা; হামাস, হিজবুল্লাহ, ইসলামি জিহাদ ও হুথি আন্দোলনের মতো মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলোকে নির্মূল করা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইসলামের নামে কথিত ইসলামপন্থি কতকগুলো গ্রুপ তৈরি করে এসব দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

সিরিয়া এমন একটি দেশ যার ভৌগোলিক অবস্থান ইসরাইলের একেবারে দোরগোড়ায়। এছাড়া, ইসরাইল ইস্যুতে অনেক দেশ আপোষ করলেও সিরিয়া নন-ইসলামিক দেশ হয়েও কোনো আপোষ করে নি। এক সময় জর্দান, মিশর ও সিরিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও মিশর ও জর্দান ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে নির্ঝঞ্ঝাট আছে কিন্তু সিরিয়া সে পথে পা বাড়ায় নি বরং ইরানের সঙ্গে মিলে সিরিয়া এখনও নিজের ও ফিলিস্তিনের দখল হয়ে যাওয়া ভূখণ্ড উদ্ধারের স্বপ্ন দেখে। সে ক্ষেত্রে সিরিয়া হচ্ছে ইসরাইলবিরোধী প্রতিরোধের প্রথম ফ্রন্ট। লেবানন ও ফিলিস্তিনের প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলোকে ইরান এবং সিরিয়াই সহযোগিতা দিয়ে আজকের এই শক্তিশালী অবস্থান এনেছে। এছাড়া, সিরিয়া কার্যত ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে রয়েছে। ফলে ষড়যন্ত্রকারীরা নিউ মিডলইস্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন করার জন্য ২০১১ সালের 'আরব বসন্ত'কে ঘুরিয়ে সিরিয়ায় নিয়ে আবদ্ধ করল এবং গোলযোগ সৃষ্টির জন্য অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছু লোককে রাস্তায় নামিয়ে দিল। এর ফাঁকে পূর্ব পরিকল্পনা মতো বাশার আসাদ সরকারকে স্বৈরশক্তি হিসেবে দেখিয়ে সিরিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে উগ্র তাকফিরি সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেওয়া হলো। শুরু হলো সিরিয়া সংকট। একইভাবে ইরাকেও পাঠানো হলো এই উগ্র গোষ্ঠীকে এবং তারা ইরাকের মসুল শহর দখল করে নিয়ে সেখানে রীতিমতো খেলাফত কায়েম করল। ইরাক ও সিরিয়া পাশাপাশি দুটি দেশ এবং দুটি দেশের সঙ্গেই ইরানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই তিন দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভৌগোলিক রূপ হচ্ছে একেবারে ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও আফগান সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল এলাকা। নিউ মিডলইস্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে গেলে এই তিন দেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে বাকি কাজ সহজ হয়ে যায়।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমেরিকা ও ইসরাইল মাঠে নামে, সঙ্গে থাকল পশ্চিমা ও আরব মিত্ররা। ইরানও তার মিত্ররা এই পরিকল্পনা বুঝতে পেরে পাল্টা মাঠে নামে। শুরু হয় দু পক্ষের লড়াই। সেই লড়াইয়ের অংশ হিসেবে জেনারেল কাসেম সোলাইমানি তথা ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী ইরাক ও সিরিয়ায় কাজ করেছে। যেখানে সামরিক পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন সেখানে তাই দিয়েছে, যেখানে ময়দানে সামরিক তৎপরতা চালানো প্রয়োজন সেখান তাই করেছে। অর্থাৎ আমেরিকা, ইসরাইল ও তাদের মিত্রদের নিউ মিডলইস্ট প্ল্যান বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে মাঠে ময়দানে লড়াই করেছেন জেনারেল সোলাইমানি। যেখানে নিউ মিডলইস্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে মরিয়া

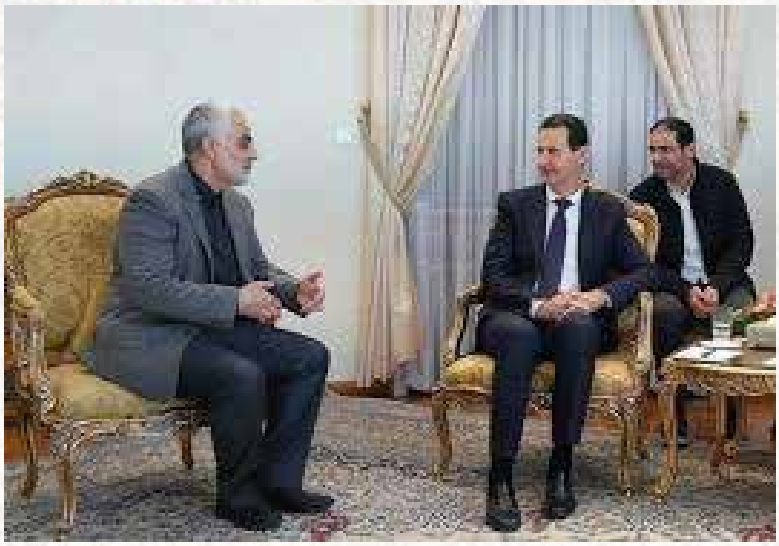

একপক্ষ সেখানে সেই পরিকল্পনা প্রতিদিন নস্যাৎ করে দিচ্ছেন জেনারেল সোলাইমানি ও তার সহযোগীরা। তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে, এ ময়দান থেকে সে ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যে যেসব প্রতিরোধকামী সংগঠন গড়ে উঠেছে তাতে রয়েছে ইরানের সরাসরি সাহায্য সহযোগিতা। অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশাল একদল প্রতিরোধ যোদ্ধা তৈরি হয়েছে। সে কাজেও জেনারেল সোলাইমানির অনন্য ভূমিকা রয়েছে। ফলে আমেরিকা ও ইসরাইলের প্রধান ও একমাত্র টার্গেটে পরিণত হন জেনারেল কাসেম সোলাইমানি। তারা জেনারেলকে সরিয়ে দেওয়া আশু কর্তব্য মনে করেছে এবং সেই বর্বর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

ইরাক ও সিরিয়ায় তৎপর সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর মূলোৎপাটন সম্ভব হলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ভিন্ন হবে– একথা ভেবে আমেরিকা, ইহুদিবাদী ইসরাইল ও তাদের পশ্চিমা এবং আঞ্চলিক মিত্ররা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক সমাধান কিংবা কূটনীতির পথ কোনোটাতেই তারা নিরাপদ বোধ করে নি। তারা বেছে নেয় সন্ত্রাসের পথ। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন উপেক্ষা করে মার্কিন সরকার ও তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী নির্জন ভোরে বাগদাদের রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে। শাহাদাতবরণ করেন ইরানের শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তা জেনারেল কাসেম সোলাইমানি। শাহাদাতের সাক্ষী হয়ে বাগদাদের রাজপথে পড়ে থাকে হাতের আংটিটি।

জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে নিজের ভূমিকা বিতর্কিত করেছে আমেরিকা। সিরিয়া ইস্যুসহ বিভিন্ন ঘটনায় আমেরিকা দাবি করে আসছে তারা উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যদিও সিরিয়ায় তৎপর উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশের প্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র এবং অর্থ যোগানের সবকিছুর সাথেই আমেরিকার সম্পৃক্ততা ছিল তারপরও তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দাবি করে আসছিল। অন্যদিকে মাঠে-ময়দানে জেনারেল কাসেম সোলাইমানি উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ইরানের কোনো শত্রুদেশও বলতে পারবে না যে, জেনারেল কাসেম সোলাইমানি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি। এরকম একটি পেক্ষাপটে জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা করে আমেরিকা প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। অর্থাৎ আমেরিকার এই ভূমিকা সন্ত্রাসীদের পক্ষে গেছে এবং সেক্ষেত্রে বলাই যায় যে, আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নি বরং সন্ত্রাসীদের পক্ষে লড়াই করছে। জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার ক্ষেত্রে এটি ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক ভুল।

জেনারেল সোলাইমানি হত্যার কারণে ইরান আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সামরিকভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, তেমনি আমেরিকার সামরিক ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতাও ইরানের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান তার প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বেশি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে বাদ দিয়ে কেউ এখন কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারবে না। ইরানের সামরিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার পাশাপাশি তার কূটনৈতিক সৌন্দর্য পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বেশকিছু দেশকে আকৃষ্ট করবে যা আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য কূটনৈতিকভাবে বড় ধরনের বিপর্যয় হিসেবে দেখা হবে। জীবন দিয়ে জেনারেল কাসেম সোলাইমানি যে সত্য রচনা করে গেছেন তার আর ক্ষয় নেই, তিনি শাহাদাতের মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন।

লেখক : সাংবদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লষক